ক্ষণিকের 'অতিথি'

সংযুক্তা গুহ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-প্রতিভার বিস্তৃত দিকগুলির অন্যতম তাঁর ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথের গল্পরচনার শুরু ১২৯০-তে হলেও পর্যাপ্তভাবে গল্প লেখা আরম্ভ হয়েছিল জমিদারির তদারকি করতে গিয়ে। ইংরেজি ১৮৯১ বা বাংলা ১২৯৮ থেকে এই পর্বে কবিতা ও গল্পরচনা একইসঙ্গে ধারাবাহিক ভাবে চলেছে। সার্থক গল্পরচনার প্রেক্ষিত হিসেবে সাজাদপুর, পতিসর প্রভৃতি অঞ্চলের নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সংস্পর্শ তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল নানাভাবেই। এই পর্বে কাজের সূত্রে বিচিত্র ধরনের লোকের সঙ্গে তাঁর মেলা-মেশার সুযোগ হয় যা তাঁকে নিয়ে গেছে জনজীবনের মাঝখানে, করে তুলেছে অভিজ্ঞ। তাঁর কথা থেকেই জানি গ্রাম্যজীবনের পথচলতি কুড়িয়ে পাওয়া জীবনের সঞ্চয় সাজিয়েই লিখেছেন গল্প। দিনানুদিন এই দেখাই আবার রূপ পেয়েছে সেই সময়ে লেখা চিঠিপত্রে। সেগুলিই 'ছিন্নপত্র' যেখানে রয়ে গেছে রঙে-রেখায় ঘটনায় গল্পগুলি গড়ে ওঠার নেপথ্য চিত্র। নদীপথে ভাসমান বোটে নদীতীরের নানা জনপদের মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার বিচিত্র জীবন-মননের নানা মাত্রার সঙ্গে মুক্ত উদার প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গী হয়ে উঠেছে এই সব ছোটগল্পগুলিতে। সহজ সরল জীবনছন্দের এই গল্পগুলিই ঘটনা ও বর্ণনার সৌন্দর্যে, উপস্থাপনার শ্রেষ্ঠত্বে অন্যতম স্থান করে নিয়েছে বিশ্বের ছোটগল্পে। সাজাদপুরের কুঠিবাড়ির নির্জনতায় নদীতীরবর্তী জীবনের আলোছায়ায় অজস্রধারায় রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন 'সাধনা' পর্বের গল্পগুলি যার অন্যতম 'অতিথি'। অতিথি ১৩০২ *সাধনার* ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক যুগ্মসংখ্যায় প্রকাশিত। ঠিক এর আগের শ্রাবণ ১৩০২ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ক্ষুধিত পাষাণ'।

ছিন্ন পত্রাবলীতে (২১৬ সংখ্যক) ১৫ আষাঢ় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন "বসে বসে সাধনার জন্যে একটি গল্প লিখছি, একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। লেখাটা প্রথম আরম্ভ করতে যতটা প্রবল অনিচ্ছা ও বিরক্তি বোধ হচ্ছিল এখন আর সেটা নেই। এখন তারই কল্পনাস্রোতের মাঝখানে গিয়ে পড়েছি—একটু একটু করে লিখছি, এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া-আলোক এবং বর্ণ এবং শব্দ আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে দৃশ্য এবং লোক এবং ঘটনা কল্পনা করছি তারই চারদিকে এই রৌদ্র বৃষ্টি, নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়া বেষ্টিত গ্রাম এই জলধারা প্রফুল্ল শস্যের খেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে এবং সৌন্দর্যে সজীব করে তুলছে—আমার নিজের মনের কল্পনা আমার নিজের কাছে বেশ রমণীয় হয়ে উঠছে।" রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার এই 'আষাঢ়ে গোছের গল্প'টিকে 'ক্ষুধিত পাষাণ' বলে অনুমান করলেও কবিজীবনীকার প্রশান্ত কুমার পাল মনে করেছেন এই গল্পটি 'অতিথি'। প্রকৃতির যে প্রত্যক্ষ প্রভাব স্পর্শ 'অতিথি' গল্পটিতে জড়িয়ে আছে তা 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটিতে নেই। সে গল্পটিকে তিনি মনে করেছেন রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন—যা হয়তো আগে লেখা এবং প্রকাশিত হয়েছে পরে। যেমন রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পই প্রকাশের অনেক আগে লেখা। বিশেষত তিনি মনে করেন ইন্দিরা দেবীকে আগে লেখা একটি পত্রে

(১৪৯ সংখ্যক) ২১শে ভাদ্র ১৩০১ (5th Sept. 1894) ক্ষুধিত পাষাণের পরিবেশ বর্ণিত। এ বিষয়ে আমরা দেখব *সাধনা*, ১৩০২ ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'অতিথি' রবীন্দ্রনাথের ৫ম গল্প সংকলন 'গল্পদশক' এ দশমতম গল্প হিসেবে প্রকাশিত হয়। গল্পগুলি *সাধনায়* প্রকাশ কালানুক্রমে মুদ্রিত। এখানেই নবমতম গল্প হিসেবে স্থান পেয়েছে 'ক্ষুধিত পাষাণ'।

মানুষের জীবনের বিচিত্র দিক বিচিত্র অনুভূতির নানা প্রান্ত ছুঁয়েই রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের সম্ভার পূর্ণ। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এর কিছু গল্পে মূলত বালক বালিকা কিশোর কিশোরীর হৃদয় রহস্য, মনস্তত্ত্বের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় মনঃসংযোগ চরিত্রগুলোকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। গভীর বিশ্লেষণে এমন গল্পগুলি শিল্পগুণেই মূল্যায়িত হয়েছে, শুধু এটা নয় প্রকৃতই 'ছুটি', 'অতিথি', 'সুভা', 'সমাপ্তি', 'পোষ্টমাস্টার', 'আপদ বলাই' প্রভৃতি গল্পের এই সব বালক-বালিকা কিশোর-কিশোরী চরিত্রগুলির মনঃসমীক্ষণে অত্যন্ত নিপুণতায় গল্পগুলিকে অনন্য করে তুলেছেন। তারাপদ-চারুশশী, ফটিক সুভা, বলাই-নীলকান্ত-রতন এরা সবাই এই বিশেষ বয়োধর্মেই উল্লেখযোগ্য। বিশেষত বালক মন বিশ্লেষণে ফটিক যেমন স্মরণীয়, তেমনি বলাই নীলকান্ত, তারাপদ হৃদয়ে গভীর ছাপ রেখে যায়। আবার অবুঝ কিশোরী মনের বেদনার্ত উত্তরণে চারু, মৃন্ময়ী রতন প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভাবধর্মে অসাধারণ।

'অতিথি' গল্পটি ছ' পরিচ্ছেদে লেখা। সহজ সপ্রতিভ, স্নেহবন্ধন মুক্ত অবাধ্য নিরাসক্ত এক কিশোর হৃদয়ের কথা। এই গল্পের তারাপদ যেন আমাদের চিরচেনা প্রতিদিনের সংসারে এক চির অচেনা অনাহূত অতিথি। কোনো মায়া-বন্ধনের ফাঁদই তাকে বাঁধতে পারে না। সে নিজের ইচ্ছেমতো আসে থাকে গায়, বন্ধন বেশি মনে হলে নিজেই চলে যায়। ঠিক যেন নদীর স্রোত, বাঁক নেয় কিন্তু থেমে থাকে না। সে সদানন্দময়। স্বভাব গুণে পারিপার্শ্বিক সকলের স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ ভালোবাসা পায়, সবাইকে নিজগুণে মন্ত্রমুগ্ধ করে অথচ সবই ফেলে রেখে চলে যায় বেদনা দিয়ে, বেদনা না পেয়ে। চলে যায় কেবল সামনে অন্য কোনোখানে। এই চির পথিকের পথ কোনোখানেই নির্দিষ্ট নয়। সব ঘরই তার ঘর অথচ কোনো ঘরই আবার তার ঘর নয়। কোথাও সে বেশিদিন থাকতে পারে না। প্রকৃতই সে প্রকৃতির সন্তান। জীবন আস্বাদনের এই ভিন্ন মাত্রায় অতিথির তারাপদ স্বতন্ত্র।

কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবু স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে নদীতীরে আহারের আয়োজন পর্বে হঠাৎই গৌরবর্ণ আয়তচোখ হাস্যময় সুকুমার এক পনেরো ষোল বছরের কিশোরের দেখা পান। ঠিক যেন তাপস বালক। সে নিজে এসে অনুরোধ করে নদীপথে নন্দীগাঁয়ে তাকে পৌঁছে দেবার জন্য—এই ছিল প্রাথমিক পরিচয়ের সূত্র। এই সূত্রেই তারাপদর মতিলালবাবুর সংসারে অনুপ্রবেশ। তিনি তাকে তাঁদের সঙ্গেই খেতে বললে কি অনায়াসে তারাপদ অপটু হিন্দুস্থানী ভৃত্যের থেকে কাজ নিয়ে রান্নাবান্নায়ও সপ্রতিভভাবে অংশগ্রহণ করে। পরে স্নান করে বোঁচকা খুলে শুভ্র বস্ত্র পরে নৌকোয় উপস্থিত হয়। মতিবাবুর স্ত্রীও এই সুন্দর বালককে দেখে স্নেহার্দ্র হয়ে ওঠেন। তারাপদ অন্ন ইত্যাদি গ্রহণ করে তার নিজের ইচ্ছানুসারেই। অন্নপূর্ণার অনুরোধ উপরোধেও সে অতিরিক্ত কিছুই গ্রহণ করে না। এভাবেই

প্রাথমিক পরিচয়ে তারাপদ তাঁদের বিস্মিত ও মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট করে। অন্নপূর্ণা ঘরছাড়া এই কিশোরকে পরম মমতায় নানা প্রশ্ন করে বুঝেছেন ছেলেটি সম্পূর্ণ নূতনতর। 'অকাতর'চিত্ত তারাপদর গৃহগত প্রাণ নয়। কোনো পিছুটান তার নেই। মা ভাই-বোন পাড়াপ্রতিবেশী সকলের অজস্র স্নেহ সিক্ত অত্যন্ত আদরের তারাপদর গৃহত্যাগের জন্য কোনো কারণও দরকার হত না। বিস্ময়ের ঘটনা আরও এইমাত্র ছ'সাত বছর বয়সেই সে গৃহত্যাগ করেছে! নিতান্ত অনাহূত যারা তারাও মাতৃক্রোড়চ্যুত হয় না যে বয়সে অথচ সকলের চোখের মণি এই ব্রাহ্মণ বালক স্বভাবত মুক্তপক্ষ এক পলাতক। স্রোতের জলের মতো, মেঘভার মুক্ত শরৎ মেঘের মতো ভাসমান। শৈশবেই বিদেশি যাত্রাদলের সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে সে পালিয়েছিল। সকলের খোঁজ করে প্রথমে তাকে ফিরিয়ে আনে। মা তাকে বুকে চেপে চোখের জলে ভাসেন, আদরে সোহাগে সবাই তাকে প্রলুব্ধ করে—তবু কোনো কিছুই তাকে আটকে রাখতে পারে না এর কারণ প্রথমত তার নিজের কাছেই এবং সকলের কাছেও ছিল সম্পূর্ণ অজানিত—"তাহার জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে। সে যখনই দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গুণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের বৃহৎ অশ্বত্থগাছের তলে কোন দূরদেশ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, অথবা বেদেরা নদীর তীরের পতিত মাঠে ছোট ছোট চাটাই বাঁধিয়া বাঁখারী ছুলিয়া চাঙারি নির্মাণ করিতে বসিয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত।" এই অজ্ঞাত, অজানার আকর্ষণেই তারাপদ যাত্রার দলের সঙ্গ নেয়—কিন্তু অধিকারীর পুত্র নির্বিশেষ স্নেহ, পুরমহিলাদের সমাদর তার সহ্য হয়নি বেশিদিন—তখন একদিন কাউকে কিছু না বলেই সে পালিয়ে যায়। কী এর কারণ সত্যিই সে জানে না—সে শুধু মুক্তিরই অভিলাষী। এইই তার চারিত্র্য। এই সূত্রে আমাদের মনে পড়ে যায় এর আগে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় 'দুই পাখি' কবিতাটির বনের পাখির ধর্মটি যে সোনার খাঁচায় বন্দি, সুখী পাখির জীবনযাপনের প্রতি অনীহা—দুই পাখির দুজনই নিজ ভাবনায় অবিচল তাই—'বনের পাখি বলে, না, আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।' আমরা জেনেছি যাত্রার গানই প্রথম তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যায়—'তারাপদ হরিণ শিশুর মতো বন্ধন ভীরু, আবার হরিণেরই মতো সংগীতমুগ্ধ।' এই সুরের দোলা শিশুবয়স থেকেই তাকে সম্মোহিত করত, তার হৃদয় দুলে উঠত। একইভাবে প্রকৃতির সমস্ত অনুষঙ্গই তাকে আপ্লুত করত। সে পাঁচালীর দলে ঢুকেছিল এই সংগীতের মোহেই কিন্তু যে মুহূর্তে দলাধ্যক্ষ তাকে গান শেখালেন, পাঁচালি মুখস্থ করাতে উদ্যোগ নিলেন সর্বোপরি বক্ষপিঞ্জরের পাখির মতো প্রিয়জ্ঞানে স্নেহ করতে লাগলেন একদিন প্রত্যুষে পাখি উড়ে গেল। দেখা যায় শুধু দলই ছাড়ে না প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসা বন্ধন এড়িয়ে যায়। এমনি নানা মোহে নানা কাজে সে মুগ্ধ হলেও কোনোটাই তাকে স্থির রাখতে পারত না। নন্দীগ্রামের জমিদারেরা সখের যাত্রা খুলছেন শুনেই জিমনাস্টিকের দল থেকে পালিয়ে সেখানে যাওয়ার জন্যই মতিলালবাবুর নৌকোয় উপস্থিত হয়েছিল মতিলালবাবুর সংসার অভিজ্ঞ প্রবীণ মানুষ। তারাপদর অমলিন তারুণ্যে মুগ্ধ হয়েই কোনোরকম সন্দেহ না করেই এই কিশোরকে পরম আদরে নৌকোয় স্থান দিলেন। সে যেন শুভ্রপক্ষ রাজহাঁস কোনো আবিলতা যেন তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

নৌকো ছেড়ে দিলে মতিলালবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণার সস্নেহ প্রশ্নের যথা সম্ভব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে নৌকোর ছাদে পালের ছায়ায় মুক্ত প্রান্তরে ঘনবসতিবেষ্টিত গ্রাম। চারিদিকের সজীব মুখরতায় তারাপদ যেন পরিত্রাণ খুঁজে পেল। এই নির্লিপ্ত বিশ্বজগৎই প্রকৃতপক্ষে তার আত্মীয়। এই প্রকৃতির জন্যই সে পিপাসার্ত। চিরনূতন প্রকৃতিই তার পরমাশ্রয়। এরই সঙ্গে নদীপ্রবাহে নৌকোর লগি ঠেলে, হাল ধরে রাঁধা-বাড়া বাজার করা সব কাজেই অত্যুৎসাহে যুক্ত হয়ে পড়ল। আবার অবকাশে রামায়ণের কুশলবের গান করে, পাঁচালী পড়ে আপন খেয়ালে সকলকে মুগ্ধ করে নদীতীরের সন্ধ্যাকাশ রসস্রোতে পূর্ণ করে তুলল। আর নিজের অজান্তেই আপন গুণে জাগিয়ে তুলল অন্নপূর্ণার পুত্রস্নেহাতুর বুভুক্ষা। কেবল জমিদার কন্যা ন'বছরের বালিকা চারুর হৃদয়, ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল বিরক্তি রাগ ও বিদ্বেষে। সে বালিকা তার মায়ের আকর্ষণের কেন্দ্রেই অভ্যস্ত। তার একাধিপত্যের জগতে তার কাছে তারাপদ যেন অসম প্রতিদ্বন্দ্বী। এমন নৌ-যাত্রাতেই তারাপদর অখেয়ালে নন্দীগ্রাম ছাড়িয়ে দিনদশেক বাদে নৌকো কাঁঠালিয়া পৌছলে তারাপদ নেমেই গ্রাম সফর করে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নানা সম্পর্ক পাতিয়ে সৌহার্দ্যবন্ধনে সকলের হৃদয় জয় করে নিল, সকলেই হয়ে উঠল তার আত্মীয়। কেবল আশ্চর্য এই—'গ্রামবাসিনী একটি বালিকার ঈর্ষা সে এখনো জয় করিতে পারিল না।...বালিকাবস্থাতেও নারীদের অন্তর্রহস্য ভেদ করা সুকঠিন, চারুশশী তাহার প্রমাণ দিল'। বালিকা চারু তারাপদর সঙ্গে সহজ বন্ধুত্বে না গেলেও সে প্রতিপন্ন করতে চায় সে তাদেরই অর্জন। চারুরই সমবয়সী সই পাঁচ বছর বয়সেই বিধবা সোনামণির সঙ্গে তারাপদর মেলামেশা—দাদা তারাপদ তাকে বাঁশি বাজিয়ে দেয়, উঁচু ডাল থেকে ফুল পেড়ে দেয় এসব সহজ আনন্দ চারু তার অসহজ মনে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না—সে রাগান্বিত থাকে—'যে তারাপদকে চারু মনে মনে বিদ্বেষভরে জর্জর করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারই একাধিকার লইয়া এমন প্রবল উদ্‌বেগ কেন।—বুঝিবে কাহার সাধ্য।' কথায় কথায় সোনামণির সঙ্গে তার ঝগড়া হতে থাকে—তার মনে কোনো তুষ্টিই নেই। তারপর কাছে চারুর এমন সব আচরণ কিন্তু কৌতুকজনকই মনে হত। আমরা নৌকোতে অবস্থানের সময়ই দেখেছি গান করে, বাঁশি বাজিয়ে গল্প শুনিয়ে কোনো ভাবেই তারাপদ তাকে বশ করতে পারেনি। অথচ মধ্যাহ্নে তারাপদ যখন নদীতে স্নান করত গৌরবর্ণ সরল তনু সঞ্চালন করে, জলদেবতার মতো সাঁতার কাটত তখন কিন্তু বালিকা চারু কৌতূহলে আকৃষ্ট হত, অথচ কাউকে জানতে না দিয়ে উপেক্ষা ভরে দেখে নিত। আর সহজ তারাপদ বুঝেই নিয়েছিল 'ক্ষুদ্র মেয়েটি একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা'। মা বাবার একমাত্র সন্তান বলেই খেয়ালি, জেদি একগুঁয়ে এবং খুঁতখুতে। একাধিপত্য তার স্বভাব বলেই সকলের প্রিয় তারাপদ, সোনামণির দাদা হয়ে ওঠা তারাপদ তার বিরক্তির কারণ হয়ে উঠল। এইসব অসন্তোষেই একদিন প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে পদাঘাতে তারাপদর বাঁশি ভেঙে দিল এবং কেঁদে ঘর থেকে বার হয়ে গেল—এ ঘটনাও তারাপদর কাছে কৌতূহলেরই বিষয় হয়ে থাকল।

জীবন পথের পথিক তারাপদর আর একটি কৌতূহল জাগ্রত হয়ে উঠল মতিলালবাবুর গ্রন্থাগারের ইংরেজি ছবির বইগুলি ঘিরে। সেই আগ্রহ দেখেই মতিলালবাবু গ্রামের এন্ট্রান্স

স্কুলের হেডমাস্টার রামরতন বাবুকে নিযুক্ত করে দিলেন। প্রখর স্মরণ শক্তি আর মনোযোগ নিয়ে এইসব গ্রন্থপথে সে যেন অন্য পৃথিবীর পান্থ হয়ে উঠল পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছু ভুলে। অস্থিরচিত্ত চারুও জেদ ধরল ইংরেজি শিখবে বলে আর এইভাবে পড়ার জগতেও সে তারাপদর প্রতিপক্ষ হতে চেয়ে নানা উপায়ে বই ছিঁড়ে, খাতায় কালি ঢেলে কলম চুরি করে উপদ্রব আরম্ভ করে। এসবও তারাপদ কৌতুকে সহ্য করেছে, অসহ্য হলে মেরেছে কিন্তু শাসন করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত একদিন কালিমাখানো খাতা ছিঁড়ে ফেললে—চারু ভেবেছিল আজ সে মার খাবে, কিন্তু বিষণ্ণ নিশ্চুপ তারাপদর কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে শেষপর্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমালাভের জন্য মনে মনে কাতর হয়ে উঠল, তবু "কেমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় সে বিদ্যা তাহার কোনোকালেই অভ্যাস ছিল না", তাই যদিও সে ছেঁড়া কাগজটিতে বড়ো বড়ো করে লিখল, 'আমি আর কখনো খাতায় কালি মাখাবো না'—বালিকা মনের একটি প্রান্ত অপরাধ কবুল করল কিন্তু তারাপদ হেসে উঠলে সে যে দীনতা প্রকাশ করে ফেলেছে এই কথাটা গোপন করতে পারলে তার ক্ষোভ যেন মিটতে পারত। অপরাধ এবং অহং-এ মিশে দ্রুত সে ঘর থেকে বার হয়ে গেল। তবু চারুর উৎপাত চলছিলই। একান্তভাবে তারাপদর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে ভেবেও সোনামণি প্রমুখের উপস্থিতিতে সে আত্মসংবরণ করতে কিছুতেই পারত না, নানা ঘটনার খামখেয়ালে সে স্বভাবেই ফিরে যেত। সোনামণির প্রতি দুর্ব্যবহারে, তারাপদর ওপর কর্তৃত্ব ইচ্ছায় পরাজয়ের গ্লানিতে কান্নাকাটি করে চারুশশী অশান্তই থাকত। কখনও যেন সে তারাপদর প্রধানা অভিভাবিকা হয়ে উঠত।

কিশোর তারাপদর জীবন এমন খাতেই বয়ে চলেছিল বছর দুয়েক, এত দীর্ঘদিন ছন্নছাড়া গৃহচ্যুত এই পান্থ কোথাও স্থির থাকেনি। তারাপদ চরিত্রটির পরিণতি পর্ব বা রূপান্তর পর্বটি অভিনব। যা মনের স্বাভাবিক দিকটিকেই ইঙ্গিত করে। পড়াশোনার মধ্যেই মূলত তার মন এবং অপূর্ব আকর্ষণ অনুভব করেছিল। এছাড়াও বয়সের নিজস্ব ধর্মের একটা প্রভাব স্বভাবতই শুরু হয়েছিল। লেখকের ভাবনায়—"বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল এবং স্থায়ী হইয়া বসিয়া সংসারের সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল ; বোধ করি, তাহার সহপাঠিকা বালিকার নিয়ত দৌরাত্ম্য চঞ্চল সৌন্দর্য অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার করিতেছিল।" লেখকের এমন ভাবনা যেমন বাস্তব তেমনি অন্যদিকে চারুরও স্বভাব খানিকটা পরিবর্তিত হচ্ছিল। চারু যেমন শাসন তর্জন বজায় রাখতে মায়ের চাবিতালা দিয়ে তারাপদর ঘরে তালা লাগিয়ে দিয়েছে তেমনি আমরা দেখেছি তারাপদ রাগ করে কথা না বলে না খাওয়ার চেষ্টা করতে চারু অনুনয় বিনয় করে ক্ষমা চেয়ে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত কান্নাকাটি করছে। এখানে চারুরও প্রতাপ যেন কমে গেছে। অসহায় ভাব ফুটে উঠছে। স্বাভাবিক নিয়মে তারাপদর বয়ঃসন্ধির নেপথ্য কারণগুলি সবটাই লেখক অনুমান করছেন তেমনি করেছেন অন্নপূর্ণা চারু সম্পর্কে। ঘটনাসূত্রে আমরা জানি মতিলালবাবু এগারো উত্তীর্ণা খেয়ালি কন্যার বিয়ের যোগাযোগ চিন্তায় স্ত্রীর পরামর্শ মতো খোঁজ খবর করে তারাপদর মা এবং ভাইয়ের কাছে বিয়ের

প্রস্তাব পাঠালেন। পরমানন্দে তাঁরাও সম্মত হলে সাবধানী মতিবাবু সমস্তটাই গোপন রাখলেন।

চারুশশী যথানিয়মে তার বিক্রম অব্যাহত রেখেই চলেছে, বর্গীর মতো তারাপদর পড়ার ঘরে এসে রাগ-বিরাগ প্রকাশ করে পড়াশোনার নিভৃতি ভঙ্গ করে তারাপদর শান্তি তোলপাড় করে তুলত। কিন্তু আশ্চর্য এই এসব ঘটনায় আমরা তার সম্পূর্ণ নতুন অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠি। যে কোনো কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করত না যে জীবনের উপরিতলে স্রোতের মতো ভাসমান থাকতে পারত সেই "নির্লিপ্ত মুক্ত স্বভাব ব্রাহ্মণ বালকের চিত্তে মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুৎ স্পন্দনের ন্যায় এক অপূর্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার হইত।" আমরা দেখি কখনো সে পড়াশোনা ছেড়ে লাইব্রেরির ছবির বইয়ের জগতে ভিন্ন এক রঙিন কল্পনালোকে বিচরণ করত। সে যে সম্পূর্ণ অন্য রকম দিবাস্বপ্ন জালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত তাতেই সে আশ্চর্য বোধ করত। কৈশোরক পর্বের এই পরিবর্তনে নিজেকেই সে আবিষ্কার করল নতুন রূপে—কারণ চারুর অদ্ভুত আচরণ লক্ষ করেও সে আর আগের মতো পরিহাস করতে পারত না। এমনকি "দুষ্টামি করিলে তাহাকে মারিবার কথা মনেও উদয় হইত না। নিজের এই গূঢ় পরিবর্তন এই আবদ্ধ-আসক্ত ভাব তাহার নিজের কাছে এক নূতন স্বপ্নের মতো মনে হইতে লাগিল।" জীবনের এই সন্ধিক্ষণে অতিথি তারাপদ নিজের মধ্যেই চির অচেনা এবং নতুন অতিথির পদপাত উপলব্ধি করেছিল। নিজেই নিজের কাছে হয়ে উঠছিল অজানা। কৈশোরোত্তীর্ণ সময়ের এমন রূপান্তর আমরা দেখেছি 'সমাপ্তির' দামাল বালিকা, মৃন্ময়ীর মধ্যেও। নিয়ত চঞ্চল মৃন্ময়ীর কাছে বিবাহবন্ধন শৃঙ্খলের মতো হয়ে উঠলেও স্বামী কলকাতায় চলে গেলে সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা সে লাভ করেছিল। যে স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় যেতে পর্যন্ত তার ইচ্ছে করেনি পরে সেও একদিন নিজের মধ্যে আগাগোড়া এক বদল অনুভব করল—তার সব শূন্য মনে হতে লাগল। কলকাতা যাওয়ার জন্য প্রাণপণ এক ইচ্ছে জেগে উঠল। বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে বিধাতার সূক্ষ্ম তরবারি ছেদ এনে দিল। মৃন্ময়ীর জন্মান্তর ঘটল। এমনভাবেই জীবনের এক সন্ধিলগ্নে তারাপদর পলাতক মনও ভিন্ন এক সংগীত শুনেছিল। অজানা এক আকর্ষণে আচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল।

দৈনন্দিন ঘটনাধারা তার নিজ গতিতে এভাবেই নদীপ্রবাহের মতো তীর ভেঙে তীর গড়ে পথ করে নিচ্ছিল। এমন পরিবর্তন পর্বেই কুড়ুলকাটার নাগবাবুদের রথযাত্রার মেলা উপলক্ষ্যে জোৎস্নালোকিত সন্ধ্যার নদীঘাটে তারাপদ দেখল সেই উৎসবের আয়োজন। কোনো নৌকোয় নাগরদোলা আবার কোনোটাতে যাত্রার দল, কোনোটা বা নানা পণ্যদ্রব্য নিয়ে দ্রুতবেগে স্রোতের অভিমুখে যাচ্ছে। কনসার্টের দল বাজনা আরম্ভ করেছে অন্যদিকে মাদল করতালে-চারিদিকে নানা উদ্দীপনায় অনন্ত আকাশতলে এক উদার আহ্বান যেন বিস্তীর্ণ করে রেখেছে। রথযাত্রার এই বিপুল আয়োজনের সঙ্গে প্রকৃতিও যেন ওতোপ্রোতভাবে তারাপদর হৃদয় নদীতে বান নিয়ে এল। নিয়ে এল বিশ্বের উৎসব প্রাঙ্গণের আমন্ত্রণ বার্তা। আলোচ্ছায়াময় দোলাচলতা থেকে মুক্তির ডাক! "দেখিতে দেখিতে পূর্বদিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন

হইল—পুবে বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল—নদীতীরবর্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল। সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে ;....” বিশ্বের এই মহোৎসবে আজ যেন সমস্ত জগৎই সামিল হয়ে এগিয়ে চলেছে। দ্রুত ধাবমান এই চরাচর। আকাশ পৃথিবী ব্যাপ্ত এই মহা আয়োজনের অনন্ত উৎসবে, অসীম আহ্বানে কেবলমাত্র নিঃস্তব্ধ নদীতীরবর্তী নির্বাপিত দীপ ঘুমন্ত কাঁঠালিয়া গ্রাম। বিয়ের আয়োজনে নির্ধারিত কর্মধারায় যথাবিহিত ঘটনা এগোতে লাগল। তারাপদর মা এবং ভাইয়েরা এল, এল বড়ো বড়ো নৌকা বোঝাই বিভিন্ন সামগ্রী। কিন্তু পরদিন সংসারবৃত্তের উৎসব মুখর আয়োজনে তারাপদকে দেখা গেল না। পৃথিবীর আমন্ত্রণ বার্তা নিয়ে—“স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘাচ্ছন্নতার রাত্রে এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।”

সংসারের আপাত সম্মোহন, মতিলালবাবু-অন্নপূর্ণার পুত্রস্নেহ আশ্চর্যচরিত্রের চারুশশীর সঙ্গে সম্পর্ক সেই জগতের মহোৎসবের কাছে ম্লান হয়ে গেছে। ক্ষণিক সময়ের স্বর্ণশৃঙ্খলে ছিঁড়ে সে চলে গেছে অন্যকোথাও। অজানিত স্রোতের উজানে।

‘অতিথি’ গল্পটিতে প্রকৃতির ভূমিকাও চরিত্রটি রূপায়ণ আমাদের মুগ্ধ করে। অসাধারণ গদ্যে বর্ণনীয় প্রকৃতি যেন চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে সর্বাংশে ভূমিকা নিয়েছে। চরিত্রটির মনন ধর্মে প্রকৃতি যেন নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিয়েছে। প্রকৃতি ও মানবজীবন এখানে অবিচ্ছেদ্য। তাই আমরা দেখেছি গল্পটি সম্পূর্ণ দুটি ধারায় এগিয়েছে। মনভোলানো মোহনরূপের তারাপদর স্বভাব বা প্রকৃতি। আর তারাপদর হৃদয় আদ্যন্ত নিমগ্ন পথে-প্রকৃতির কাছেই ফিরে গেছে। প্রকৃতির প্রবল টানই পরিবর্তনের মুখোমুখি দোলাচল তারাপদকে স্থির লক্ষ্যের দিকেই নিয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পেই একটা ঐক্যের সংগতি থেকে যায়। সেখানে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির আরও কয়েকটি চরিত্র তুলনামূলকভাবে আমাদের স্মৃতিপথে এসে দাঁড়ায়। যেমন ‘আপদ’ গল্পের নীলকান্ত বা ছুটি গল্পের ফটিক। এরা সময়বয়সি, ঘটনাসূত্রে খানিক মিল থাকলেও এরা সমমানসতার নয়। অশান্ত গ্রাম্য বালক ফটিক গ্রাম ছেড়ে অনেক আগ্রহে, নূতনের টানে অত্যুৎসাহে কলকাতায় এসেছিল। পরিণামে অনাদর অবহেলায় সে চেয়েছিল মায়ের কাছে ফিরতে, ফিরতে চেয়েছিল ঘরে। কিন্তু তারাপদর ভয় ঘরকেই। বৈপরীত্যের কারণেই তারাপদর পাশে তার কথা মনে আসে। একইভাবে অতিথি গল্পের ঘটনাসূত্রে আংশিক ভাবে মিল পাওয়া যায় প্রায় একই পটভূমিকায় ‘আপদ’ গল্পের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র নীলকান্তর। শরৎ ও কিরণের বাগানবাড়িতে নৌকাডুবির পর সাঁতার জানার কারণে বেঁচে গিয়ে আশ্রিত হয় নীলকান্ত। লম্বাচুল বড়ো বড়ো চোখ নীলকান্তও যাত্রাদলে গান

গাইত। দুজনেই কিশোর, যাত্রাদল বিষয়ে ঐক্য থাকলেও এই ব্রাহ্মণবালক অন্তঃপ্রকৃতিতে সম্পূর্ণ আলাদা। নিঃসন্তান কিরণের স্নেহ ভালোবাসায় লেখাপড়া শুরু করে। কিরণের দেবর সতীশের আগমনে চাপা অভিমান তাকে বেদনাতুর করে তোলে। কিরণ তাকে দেশে যেতে বললে সে একেবারে কেঁদে ফেলে। সতীশকে জব্দ করতেই তার দোয়াত সরিয়ে রাখে। লক্ষণীয় এসবই সে করে স্নেহ-নীড় হারানোর ভয়ে। তার বাক্সেই দোয়াত পাওয়া গেলে শেষ পর্যন্ত তারও কোনো উদ্দেশ্য পাওয়া গেল না। এই দুই আশ্রিত তারাপদ ও নীলকান্ত পরিবার ছেড়ে চলে গেলেও একজন বন্ধন ভীরু ও অন্যজন স্নেহ ভিক্ষু, গৃহ আসক্ত। এক্ষেত্রেও 'দুই পাখি'র বনের পাখি ও খাঁচার পাখির কথাই আমাদের মনে হয়। সোনার শৃঙ্খল ছেড়ে স্নেহ-প্রেম ভালোবাসা ছেড়ে উন্মুক্ত নীলাকাশেই বনের পাখির পক্ষ-বিস্তার।

উপসংহারে আমাদের মনে হতে পারে যথার্থই তারাপদই এই গল্পে মতিলালবাবুর অতিথি। আমরা দেখি সে ক্ষণিকের অতিথি। হঠাৎই এসেছিল যেমন তেমনই একদিন হঠাৎই উধাও হয়ে যায়। অনেক পরে রচিত রবীন্দ্রনাথের—

'হে ক্ষণিকের অতিথি
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া
ঝরা শেফালীর পথ বাহিয়া।।
কোন অমরার বিরহিনীরে চাহনি ফিরে।'

গানটির অভিব্যক্তভাবে যেন তারাপদ চরিত্রেরই ভাব সাদৃশ্য আমাদের অনুভবে একটি নিটোল মাত্রা পায়। অমরার বিরহিনীর সঙ্গে চারুর তুলনা না হলেও তার ক্ষুদ্র প্রাণে বেদনার দীপ জ্বেলে এই ক্ষণিক অতিথি পথিক পথের নেশায় আবারও নূতন নূতন পথে যাত্রা করেছে।